

সংস্কার

BANGLADARSHIAN.COM  
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## ॥সংস্কার॥

চিত্রগুপ্ত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতায় জমা করেন যা থাকে পাপীর নিজের অগোচরে। তেমনি এমন পাপও ঘটে যাকে আমিই চিনি পাপ ব'লে, আর কেউ না। যেটার কথা লিখতে বসেছি সেটা সেই জাতের। চিত্রগুপ্তের কাছে জবাবদিহি করবার পূর্বে আগে-ভাগে কবুল করলে অপরাধের মাত্রাটা হাল্কা হবে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল কাল শনিবার দিনে। সেদিন আমাদের পাড়ায় জৈনদের মহলে কী-একটা পরব ছিল। আমার স্ত্রী কলিকাকে নিয়ে মোটরে করে বেরিয়েছিলুম-চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল বন্ধু নয়নমোহনের বাড়িতে।

স্ত্রীর কলিকা নামটি শ্বশুর-দত্ত, আমি ওর জন্য দায়ী নই। নামের উপযুক্ত তাঁর স্বভাব নয়, মতামত খুবই পরিস্ফুট। বড়োবাজারে বিলিতি কাপড়ের বিপক্ষে যখন পিকেট করতে বেরিয়েছিলেন, তখন দলের লোক ভক্তি ক'রে তাঁর নাম দিয়েছিল ধুবব্রতা। আমার নাম গিরীন্দ্র; দলের লোক আমাকে আমার পত্নীর পতি ব'লেই জানে, স্বনামের সার্থকতার প্রতি লক্ষ করে না। বিধাতার কৃপায় পৈতৃক উপার্জনের গুণে আমারও কিঞ্চিৎ সার্থকতা আছে। তার প্রতি দলের লোকের দৃষ্টি পড়ে চাঁদা-আদায়ের সময়।

স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর স্বভাবের অমিল থাকলেই মিল ভালো হয়, শুকনো মাটির সঙ্গে জলধারার মতো। আমার প্রকৃতি অত্যন্ত টিলে, কিছুই বেশি ক'রে চেপে ধরি নে। আমার স্ত্রীর প্রকৃতি অত্যন্ত আঁট, যা ধরেন তা কিছুতেই ছাড়েন না। আমাদের এই বৈষম্যের গুণেই সংসারে শান্তিরক্ষা হয়।

কেবল একটা জায়গায় আমাদের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ঘটেছে তার আর মিটমাট হতে পারল না। কলিকার বিশ্বাস, আমি স্বদেশকে ভালোবাসি নে। নিজের বিশ্বাসের উপর তাঁর বিশ্বাস অটল-তাই আমার আন্তরিক দেশ-ভালোবাসার যতই প্রমাণ দিয়েছি, তাঁদের নির্দিষ্ট বাহ্য লক্ষণের সঙ্গে মেলে না ব'লে কিছুতেই তাকে দেশ-ভালোবাসা ব'লে স্বীকার করাতে পারি নে।

ছেলেবেলা থেকে আমি গ্রন্থবিলাসী, নতুন বইয়ের খবর পেলেই কিনে আনি। আমার শত্রুরাও কবুল করবে যে, সে বই প'ড়েও থাকি; বন্ধুরা খুবই জানেন যে, প'ড়ে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়ি নে।-সেই আলোচনার চোটে বন্ধুরা পাশ কাটিয়ে চলাতে অবশেষে তার নাম দিয়েছি কোণ-বিহারী। ছাদে ব'সে তার সঙ্গে আলাপ করতে করতে এক-একদিন রাত্তির দুটো হয়ে যায়। আমরা যখন এই নেশায় ভোর তখন আমাদের পক্ষে সুদিন ছিল না। তখনকার পুলিশ কারও বাড়িতে গীতা দেখলেই সিডিশনের প্রমাণ পেত। তখনকার দেশভক্ত যদি দেখত কারও ঘরে বিলিতি বইয়ের পাতা কাটা তবে তাকে জানত দেশবিদ্রোহী। আমাকে ওরা শ্যামবর্ণের প্রলেপ দেওয়া শ্বেত-দ্বৈপায়ন ব'লেই গণ্য করত। সরস্বতীর বর্ণ সাদা ব'লেই সেদিন দেশভক্তদের কাছ থেকে তাঁর পূজা মেলা শক্ত হয়েছিল। যে সরোবরে তাঁর শ্বেতপদা ফোটে সেই সরোবরের জলে দেশের কপাল-পোড়ানো আগুন নেবে না, বরঞ্চ বাড়ে, এমনি একটা রব উঠেছিল।

সহধর্মিণীর সদৃষ্টান্ত ও নিরন্তর তাগিদ সত্ত্বেও আমি খদ্দর পরি নে; তার কারণ এ নয় যে, খদ্দরে কোনো দোষ আছে বা গুণ নেই, বা বেশভূষায় আমি শৌখিন। একেবারে উল্টো-স্বাদেশিক চাল-চলনের বিরুদ্ধ অনেক অপরাধ আমার আছে, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা তার অন্তর্গত নয়। ময়লা মোটা রকমের সাজ, আলুথালু রমকে ব্যবহার করাটাই আমার অভ্যাস। কলিকার ভাবান্তর ঘটবার পূর্ববর্তী যুগে চীনেবাজারের আগা-চওড়া জুতো পরতুম, সে জুতোয় প্রতিদিন কালিমা-লেপন করিয়ে নিতে ভুলতুম, মোজা পরতে আপদ বোধ হত, শাট না পরে পাঞ্জাবি পরতে আরাম পেতুম, আর সেই পাঞ্জাবিতে দুটো-একটা বোতামের অভাব ঘটলেও খেয়াল করতুম না-ইত্যাদি কারণে কলিকার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হবার আশঙ্কা ঘটেছিল।

সে বলত, “দেখো, তোমার সঙ্গে কোথাও বেরোতে আমার লজ্জা করে।”

আমি বলতুম, “আমার অনুগত হবার দরকার নেই, আমাকে বাদ দিয়েই তুমি বেরিয়ো।”

আজ যুগের পরিবর্তন ঘটেছে, আমার ভাগ্যের পরিবর্তন হয় নি। আজও কলিকা বলে, “তোমার সঙ্গে বেরোতে আমার লজ্জা করে।” তখন কলিকা যে দলে ছিল তাদের উর্দি আমি ব্যবহার করি নি, আজ যে দলে ভিড়েছে তাদের উর্দিও গ্রহণ করতে পারলুম না। আমাকে নিকে আমার স্ত্রীর লজ্জা সমানই রয়ে গেল। এটা আমারই স্বভাবের দোষ। যে-কোনো দলেরই হোক, ভেক ধারণ করতে আমার সংকোচ লাগে। কিছুতেই এটা কাটাতে পারলুম না। অপর পক্ষে মতান্তর জিনিসটা কলিকা খতম করে মেনে নিতে পারে না। বর্নার ধারা যেমন মোটা পাথরটাকে বারে বারে ঘুরে ফিরে তর্জন করে বৃথা ঠেলা দিতেই থাকে, তেমনি ভিন্ন রুচিকে চলতে ফিরতে দিনে রাতে ঠেলা না দিয়ে কলিকা থাকতে পারে না; পৃথক মত নামক পদার্থের সংস্পর্শমাত্র ওর স্নায়ুতে যেন দুর্নিবারভাবে সুড়সুড়ি লাগায়, ওকে একেবারে ছটফটিয়ে তোলে।

কাল চায়ের নিমন্ত্রণে যাবার পূর্বেই আমার নিখদ্দর বেশ নিয়ে একসহস্র-একতম বার কলিকা যে আলোচনা উত্থাপিত করেছিল তাতে তার কণ্ঠস্বরে মাধুর্যমাত্র ছিল না। বুদ্ধির অভিমান থাকাতে বিনা তর্কে তার ভৎসনা শিরোধার্য করে নিতে পারি নি-স্বভাবের প্রবর্তনায় মানুষকে এত ব্যর্থ চেষ্টিতেও উৎসাহিত করে। তাই আমিও একসহস্র-একতম বার কলিকাকে খোঁটা দিয়ে বললুম, “মেয়েরা বিধিদত্ত চোখটার উপর কালাপেড়ে মোটা ঘোমটা টেনে আচারের সঙ্গে আঁচলের গাঁট বেঁধে চলে। মননের চেয়ে মাননেই তাদের আরাম। জীবনের সকল ব্যবহারকেই রুচি ও বুদ্ধির স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সংস্কারের জেনানায় পর্দানশীন করতে পারলে তারা বাঁচে। আমাদের এই আচারজীর্ণ দেশে খদ্দর-পরটা সেইরকম মালা-তিলকধারী ধার্মিকতার মতোই একটা সংস্কারে পরিণত হতে চলেছে ব’লেই মেয়েদের ওতে এত আনন্দ।”

কলিকা রেগে অস্থির হয়ে উঠল। তার আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে দাসীটা মনে করলে, ভাষাকে পুরো ওজনের গয়না দিতে ভর্তা বুঝি ফাঁকি দিয়েছে। কলিকা বললে, “দেখো, খদ্দর-পরার শুচিতা যেদিন গঙ্গাস্নানের মতোই দেশের লোকের সংস্কারে বাঁধা পড়ে যাবে সেদিন দেশ বাঁচবে। বিচার যখন স্বভাবের সঙ্গে এক হয়ে

যায় তখন সেটা হয় আচার। চিন্তা যখন আকারে দৃঢ়বদ্ধ হয় তখন সেটা হয় সংস্কার; তখন মানুষ চোখ বুজে কাজ করে যায়, চোখ খুলে দ্বিধা করে না।”

এই কথাগুলো অধ্যাপক নয়নমোহনের আশু বাক্য; তার থেকে কোটেশনমার্কা ক্ষয়ে গিয়েছে, কলিকা ওগুলোকে নিজের স্বচিন্তিত বলেই জানে।

‘বোবার শত্রু নেই’ যে পুরুষ বলেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত। কোনো জবাব দিলুম না দেখে কলিকা দ্বিগুণ ঝোঁকে উঠে বললে, “বর্ণভেদ তুমি মুখে অগ্রাহ্য কর অথচ কাজে তার প্রতিকারের জন্য কিছুই কর না। আমরা খদ্দর প’রে প’রে সেই ভেদটার উপর অখণ্ড সাদা রঙ বিছিয়ে দিয়েছি, আবরণভেদ তুলে দিয়ে বর্ণভেদটার ছাল ছাড়িয়ে ফেলেছি।”

বলতে যাচ্ছিলুম, ‘বর্ণভেদটা মুখেই অগ্রাহ্য করেছিলুম বটে যখন থেকে মুসলমানের রান্না মুর্গির ঝোল গ্রাহ্য করেছিলুম। সেটা কিন্তু মুখস্থ বাক্য নয়, মুখস্থ কার্য—তার গতিটা অন্তরের দিকে। কাপড় দিয়ে বর্ণ-বৈষম্য ঢাকা দেওয়াটা বাহ্যিক; ওতে ঢাকা দেওয়াই হয়, মুছে দেওয়া হয় না।’ তর্কটাকে প্রকাশ করে বলবার যোগ্য সাহস কিন্তু হল না। আমি ভীর্ণ পুরুষমানুষ মাত্র, চুপ করে রইলুম। জানি আপসে আমরা দুজনে যে-সব তর্ক শুরু করি কলিকা সেগুলিকে নিয়ে ধোবার বাড়ির কাপড়ের মতো আছড়িয়ে কচলিয়ে আনে তার বাহিরের বন্ধুহল থেকে। দর্শনের প্রোফেসর নয়নমোহনের কাছ থেকে প্রতিবাদ সংগ্রহ করে তার দীপ্ত চক্ষু নীরব ভাষায় আমাকে বলতে থাকে, ‘কেমন জব্দ।’

নয়নের ওখানে নিমন্ত্রণে যাবার ইচ্ছা আমার একটুও ছিল না। নিশ্চয় জানি, হিন্দু-কাল্চারে সংস্কার ও স্বাধীন বুদ্ধি, আচার ও বিচারের আপেক্ষিক স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতায় আমাদের দেশকে অন্য-সকল দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে, এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তপ্ত চায়ের ধোঁয়ার মতোই সূক্ষ্ম আলোচনায় বাতাস আর্দ্র ও আচ্ছন্ন হবার আশু সম্ভাবনা আছে। এ দিকে সোনালি পত্রলেখায় মণ্ডিত অখণ্ডিতপত্রবতী নবীন বহিগুলি সদ্য দোকান থেকে আমার তাকিয়ার পাশে প্রতীক্ষা করছে; শুভদৃষ্টি মাত্র হয়েছে, কিন্তু এখনো তাদের ব্রাউন মোড়কের অবগুণ্ঠন মোচন হয় নি; তাদের সম্বন্ধে আমার পূর্বরাগ প্রতি মুহূর্তে অন্তরে অন্তরে প্রবল হয়ে উঠেছে। তবু বেরোতে হল; কারণ ধ্রুবব্রতার ইচ্ছাবেগ প্রতিহত হলে সেটা তার বাক্যে ও অবাক্যে এমন-সকল ঘূর্ণিরাপ ধারণ করে, যেটা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

বাড়ি থেকে অল্প একটু বেরিয়েছি। যেখানে রাস্তার ধারে কলতলা পেরিয়ে খোলার চালের ধারে স্কুলোদের হিন্দুস্থানি ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা নানাপ্রকার অপথ্য সৃষ্টি হচ্ছে তার সামনে এসে দেখি বিষম একটা হল্লা। আমাদের প্রতিবেশী মাড়োয়ারিরা নানা বহুমূল্য পূজোপচার নিয়ে যাত্রা করে সবে-মাত্র বেরিয়েছে। এমন সময় এই জায়গাটাতে এসে ঠেকে গেল। শুনতে পেলেম মার-মার ধ্বনি। মনে ভাবলুম, কোনো গাঁটকাটাকে শাসন চলছে।

মোটরের শিঙা ফুকতে ফুকতে উত্তেজিত জনতার কেন্দ্রের কাছে গিয়ে দেখি আমাদের পাড়ার বুড়ো সরকারি মেথরটাকে বেদম মারছে। একটু আগেই রাস্তার কলতলায় স্নান সেরে সাফ কাপড় পরে ডান হাতে এক বালতি জল ও বগলে ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে সে যাচ্ছিল। গায়ে চেক-কাটা মেরজাই, আঁচড়ানো চুল ভিজে; বাঁ হাত ধরে সঙ্গে চলেছিল আট-নয় বছরের এক নাতি। দুজনকেই দেখতে সুশ্রী, সুঠাম দেহ। সেই ভিড়ে কারও সঙ্গে বা কিছুর সঙ্গে তাদের ঠেকাঠেকি হয়ে থাকবে। তার থেকে এই মারের সৃষ্টি। নাতিটা কাঁদছে আর সকলকে অনুনয় করছে, “দাদাকে মেরো না।” বুড়োটা হাত জোড় করে বলছে, “দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি, কসুর মাফ করো।” অহিংসাব্রত পুণ্যার্থীদের রাগ চড়ে উঠছে। বুড়োর ভীত চোখ দিয়ে জল পড়ছে, দাড়ি দিয়ে রক্ত।

আমার আর সহ্য হয় না। ওদের সঙ্গে কলহ করতে নামা আমার পক্ষে অসম্ভব। স্থির করলুম, মেথরকে আমার নিজের গাড়িতে তুলে নিয়ে দেখাব আমি ধার্মিকদের দলে নই।

চঞ্চলতা দেখে কলিকা আমার মনের ভাব বুঝতে পারল। জোর করে আমার হাত চেপে ধরে বললে, “করছ কী। ও যে মেথর!”

আমি বললুম, “হোক-না মেথর, তাই ব’লে ওকে অন্যায় মারবে?”

কলিকা বললে, “ওরই তো দোষ। রাস্তার মাঝখান দিয়ে যায় কেন। পাশ কাটিয়ে গেলে কি ওর মানহানি হত।”

আমি বললুম, “সে আমি বুঝি নে, ওকে আমি গাড়িতে তুলে নেবই।”

কলিকা বললে, “তা হলে এখনি এখানে রাস্তায় নেমে যাব। মেথরকে গাড়িতে নিতে পারব না—হাড়িডোম হলেও বুঝতুম, কিন্তু মেথর!”

আমি বললুম, “দেখছ না স্নান করে ধোপ দেওয়া কাপড় পরেছে? এদের অনেকের চেয়ে ও পরিষ্কার।”

“তা হোক-না, ও যে মেথর!”

শোফারকে বললে, “গঙ্গাদীন, হাঁকিয়ে চলে যাও।”

আমারই হার হল। আমি কাপুরুষ। নয়নমোহন সমাজতত্ত্বঘটিত গভীর যুক্তি বের করেছিল—সে আমার কানে পৌঁছল না, তার জবাবও দিই নি।

মাদ্রাজ

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

॥সমাপ্ত॥